Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 40 – 46
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অভিজিৎ সেনের গল্পে সাম্প্রদায়িকতা ও ছিন্নমূল মানুষের কথা

বন্দিতা চক্রবর্তী
এম.ফিল, গবেষক
বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: banditachakraborty15@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
partition, refugee, communalism, Bangladesh, riots, poverty, Hindu Muslims, life-struggle.

Abstract

In 70s, Abhijit Sen was one of those authors who started a new era in modern Bengali fiction. Most of his writings were based on different areas of East Bengal which is now Bangladesh, North Bengal, and Kolkata. His own experiences, observations and realizations were reflected in his plots. People from lower economic and social class, their Superstitions and life history as well as partition, communal riots, and struggle of refugees- all triggered him as a storyteller. After the riot, he witnessed the Hindu exodus as a victim. He brought these experiences in his stories. He expressed through his characters what he felt while leaving his motherland, family, their age-old homestead. These characters are mouthpiece of the author. He also showed that how the migrants faced different kind of troubles in this new land. Many people were left penniless and crossed the border almost bare handed. Uprooted refugees had to trespass into the barren lands of powerful people, were threatened and attacked, got driven away forcefully many times, fought with wild animals and serpents just to find a shelter for their families. Abhijit's characters even identified themself in those repulsed animals after driving them away and felt sympathy for them. They may adjust with their present, but Abhijit Sen's characters still struggle with their past. They reminisce about that part of land and try to keep the connection alive. Just like a Hindu, many Muslims also left India for their new land. They also had to settle their home in a new atmosphere. He depicted clash between two religions but ultimately wished for their harmony. He also talked about the tortures perpetrated on women caused by the partition.

Discussion

সাত-আট দশকের বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শক্তিশালী লেখক অভিজিৎ সেন। তিনি পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার ঝালকাঠি মহাকুমার কেওড়া গ্রামে ১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ই বরিশাল জেলার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। অভিজিৎ সেন নিজেও এই সমস্যার সম্মুখীন হন। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁকে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে নিজের বাস্তুভিটে ছেড়ে চলে আসতে হয় এদেশে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন কীভাবে দাঙ্গার সময়ে আতঙ্কিত হিন্দু পরিবারগুলি রাতারাতি ভিটের মায়া ত্যাগ করে, সর্বস্ব ফেলে রেখে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় চলে যাচ্ছে সীমান্তের দিকে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর দেশভাগের গল্পগুলি। তিনি জানান -

> "আমাদের পুরোনো বাড়িটার দোতালার ছাদে ইটভাঙ্গা, ভাঙা কাচের বোতল ইত্যাদি জড়ো করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গাবাজের একটি দল যেদিন ধ্বনি দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে নিচের উঠোনে এসে থেমেছিল, সেদিন ইটের টুকরোর মত প্রস্তরযুগীয় অস্ত্রও আমাদের অভিভাবকরা ব্যবহার করতে পারেনি। আমার শিশু বয়সের এই অভিজ্ঞতার কথা সীমান্ত গল্পে বিস্তারিতভাবে লিখেছি।"[১]

'সীমান্ত'[২] গল্পের প্রধান চরিত্র বিভূতি অভিজিৎ সেনেরই আত্মস্বরূপ। অভিজিতের স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি দাঙ্গার কারণে নিজের দেশ ছেড়ে শৈশবেই তাঁকে চলে আসতে হয় এদেশে। আলোচ্য গল্পে সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাই যেন বিভূতির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন তিনি। গল্পের শুরুতে দেখি বিভূতি তার এগারো বছরের ছেলেকে নিয়ে বাসে চেপে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দেখাতে নিয়ে আসছে। সীমান্ত দেখার আগ্রহে বিভূতির ছেলে খোকা রীতিমত উত্তেজিত, অবশ্য উত্তেজনা বিভূতিরও কিছু কম নয়। দুজনের উত্তেজনার কারণ অবশ্য এক নয়। বিভূতির বিগত বত্রিশ বছর বরিশালে নিজের দেশ, আদিবাড়ির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। যে বাসে বিভূতিরা সীমান্ত দেখতে যাচ্ছিল সেই বাসেরই এক সহযাত্রী নরেন কথায় কথায় সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ আনেন। নরেনের কথায় এখনো মুসলিমবিদ্বেষ প্রকাশ পায় যার সঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে সব হারিয়ে চলে আসা বিভূতিও সহমত হতে পারে না, কারণ পূর্ববঙ্গে সে যে পরিবেশে বড় হয়েছিল সেখানে বিভূতির বাবা ধর্মীয় ভেদাভেদ মানতেন না। ওদেশে নুরুল, জিয়ল গাজীরা বিভূতির বাবার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। বিভূতির বাবার থিয়েটারে জিয়ল গাজী হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র ভীম, ঘটোৎকচের ভূমিকায় অভিনয়ও করেছে একাধিকবার। বরিশালের দাঙ্গার পরে যখন হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসছিল, তখন সেই জিয়ল তার দলবল নিয়ে বিভূতির ঘরের বৈঠকখানায় হাজির হয়ে বিভূতির বাবাকে ডেকে পাঠায়। একদা অনুগত জিয়লের সেদিনের সেই আগ্রাসী রূপ দেখে অবশেষে বিভূতির বাবার অবিশ্বাস জন্মায় জিয়লের প্রতি। লেখক দেখিয়েছেন এর পর থেকেই বিভূতির বাবার মুসলমান সমাজের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি হয়। বিভূতিরা কলকাতায় এসে পার্কসার্কাসে বসবাস শুরু করলেও চৌষট্টি সালের কলকাতার দাঙ্গায় মুসলমানদের কারণেই আবার বিভূতিদের পাড়া ছাড়া হতে হয়। বিভূতি তার ছেলে খোকার মনে এই সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করতে চায়নি। কলকাতায় স্কুলে পড়ার সময় বিভূতির শহিদ নামে একটি মুসলিম ছেলের সঙ্গে বচসা ও মারামারি হয়। শহিদের বাবা স্কুলের মাস্টার মশাইকে এই মর্মে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে 'ইস্কুলে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হচ্ছে'। শহিদ এতই জেদি ছিল যে বিভূতি চাইলেও তার সঙ্গে কখনোই সৎভাব বজায় রাখতে পারেনি। গল্পের শেষে আমরা দেখি এক অশিক্ষিত মুসলমান দম্পতিকে সাহায্য করছে বিভূতি। তারা দাঙ্গার সময় এক কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে মানুষ করেছিল। তাকে বিয়ে দিয়েছিল এদেশে। সেই দম্পতির সবকিছু লুঠ হয়ে যাওয়ায় টাকা দিতে পারেনি বাসের। তাই তারা ওই বাসেই সীটে না বসে নিচে বসেছিল। আবার ধর্মে মুসলিম হওয়ায় কন্ডাক্টরও তাদের সঙ্গে খুব একটা ভালো ব্যবহার করছিল না। বিভূতি তাদের টিকিটের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করলে বাসের অন্য যুবকরা বিভূতিকে বিদ্রূপ করে। দেশভাগের এতদিন পরে বর্তমান সময়েও যে সাধারণ মানুষের মনে সাম্প্রদায়িকতা বজায় আছে- গল্পে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন অভিজিৎ সেন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়দুটিকে মানুষ আজও আলাদা চোখেই দেখে। আমরা দেখি গল্পের শেষে লেখক দুই বৈরী সম্প্রদায়ের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। বিভূতি আর খোকা যেদিন সীমান্ত দেখতে গিয়েছিল, সেই দিনটা ছিল ইদ। মানুষের ভিড়ে বাংলাদেশের সীমানার চিহ্ন মুছে গেছে। এই মেলবন্ধন ইদ আর বিজয়া দশমীর দিনই কেবল দেখা যায়। তাই বিভূতি যে মুসলমান দম্পতিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল তারা বিনা বাধায় এই সমারোহের সময় সীমান্ত পার হয়ে যায়। বিভূতি খোকাকে সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমান জনতাকে দেখিয়ে বলে -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 40 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"খোকা এর মধ্যে কোন লোকটা হিন্দু, কোন লোকটা মুসলমান খুঁজে বের করতে পারবি?" (পৃ. ১১০)

'হিমঘর'[৩] গল্পটিতে লেখক দেশভাগের ফলে মানুষের খেদ, আর্তি ও নৈরাশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশ থেকে কর্নেল আসরফ আমেদের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞরা ভারতে আসেন সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করতে। এই সংরক্ষণাগার নিয়ে আলোচনা করছিলেন কর্নেল ও জনার্দন মহাপাত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্নেলের স্ত্রী ও নিশীথ। বেগম আমেদ ও নিশীথের কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায় বেগম আমেদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন বাংলাদেশে বসবাস করেন আর নিশীথ দেশভাগের পর এখানে এসেছেন। লেখক বলেন -

"একজন বাংলাদেশীর কাছে একজন ভারতীয়ের ঘোষণা, 'আমার দেশ ফরিদপুরে!" (পৃ. ১১৭)

স্বামীকে না জানিয়ে বেগম আমেদ নিশীথের সঙ্গে তাদের পার্ক সার্কাস-এর পুরোনো বাড়িতে যান। তিনি তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন আমীর আলি অ্যাভিনিউতে। সেখানে পৌঁছে কেবলই পুরোনো স্মৃতি ভেসে আসে তাঁর মনে। বেকবাগান, খেলার মাঠ, কিছু ফুটপাতের অস্তিত্ব - এসবের মধ্যেই নিজের আনন্দ খুঁজে পান বেগম আমেদ। উনিশশো পঞ্চান্ন-ছাপান্ন সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে হয় তাঁকে। যে বাড়িতে বেগম আমেদ থাকতেন সেই বাড়ির মানুষজনদের কথাও তাঁর স্মরণে আসে। নিজের বাড়িটি গলির মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। যে গলি তখন নির্জন ছিলো এখন সেখানে ভিড় করে আছে মানুষ। আমরা দেখতে পাই নিশীথ ও বেগম আমেদ দুজনেই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছে তবু তাদের ফেলে আসা দেশের প্রতি মায়া কিন্তু কমেনি। নিজেদের আগের দেশে কাটানো শৈশব, মানুষজন সবই আজ শুধু স্মৃতি হয়ে আছে তাদের কাছে। বেগম আমেদের বাবা যেমন আজও কলকাতাকেই নিজের দেশ মনে করেন তেমনি নিশীথও ফরিদপুরের প্রতি নাড়ির টান অনুভব করে।

'**শেয়াল**'[৪] গল্পটিতে অভিজিৎ সেন বাস্তুচ্যুত কিছু মনুষ্যেতর প্রাণির বহুদিনের প্রিয়, নিরাপদ বাস্তু হারানোর হতাশার মধ্যে দিয়ে দেশভাগ পরবর্তী শরণার্থীদের যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা দেখি সহদেব বিশ্বাস ও তার গোষ্ঠীর লোকেরা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হবার ফলে জ্ঞাতিদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও বাস্তহারা হয়ে যায়। উদ্বাস্ত মানুষের কষ্ট, আর্তি অভিজিৎ সেনের হৃদয় স্পর্শ করেছে। সীমান্তের ধার ঘেঁষে বিন্ন খাড়ি নামক এক জলাভূমিতে সহদেব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় এক একর জমির পাট্টা নিয়েছে। প্রতি বছর বর্ষায় প্লাবিত হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাওয়া এই জলাজমি স্থানীয় লোকেদের পছন্দ না হলেও সহদেবের পছন্দ হয়। আসলে উদ্বাস্ত মানুষের পক্ষে তখন মাথা গোঁজার ঠাঁই বানানোর মত এক চিলতে জমি জোগাড় করতে পারাটাই ছিল রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার। জমি নিয়ে বাছবিচার করার বিলাসিতা তাদের ছিল না। তাই গল্পেও আমরা দেখি সহদেব বিন্ন খাড়ি জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে বিষধর সাপের তোয়াক্কা না করেই। বেনাবনের ভেতরে প্রবেশ করার পথে সে সম্মুখীন হয় দাঁতালো, হিংস্র জানোয়ারের। জমি খুঁজতে খুঁজতে সহদেব শেয়ালের আস্তানায় চলে আসলে প্রায় নেকড়ের আকৃতির দাঁতালো শেয়াল সহদেবকে আক্রমণে উদ্যত হয়। সহদেব নিজের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এত কষ্টে যে জমি দখল করেছে, সেই জমি সে কিছুতেই শেয়ালদের দখলে যেতে দেবে না। প্রবল ক্রোধে সে কোদালের কোপ চালায় শেয়ালের ওপর। ওদিকে ক্রুদ্ধ শেয়ালও যেন বলছে 'এই ভুঁই আমার'। আদিমকালের মতো জন্তু ও মানুষের বাস্তজমি দখলের লড়াই যেন আবার ফিরে এসেছে আধুনিক, সুসভ্য, আলো ঝলমলে বিংশ শতাব্দীতে। এই বৈপরীত্য, এই দ্বন্দ্বই গল্পটির মূল উপজীব্য। দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনধারণের মানের রাতারাতি পতন হয়েছিল। শিক্ষা, রুচি ও অর্থের সহাবস্থানে অর্জিত লালিত্য ও শ্রী খসে পড়ায় আবার মানবজীবন জন্তুর স্তরে নেমে গেছে। সহদেব জানে এই জমি যেমন তার দরকার তেমনই তার গোষ্ঠীর মানুষও তার মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। চার-পাঁচটি জানোয়ারকে হত্যা করে শেষ পর্যন্ত সহদেবই জয়ী হয়। অবশেষে বাকি শেয়ালগুলি যখন ভয়ে তাদের বাসস্থান ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন সহদেবের যুদ্ধজয়ের আনন্দের মধ্যেও সে প্রাণিগুলির জন্য সমবেদনা বোধ করে। নিশ্চিতভাবে তার মনে হয় তাকে যেভাবে নিজেদের বাস্তভিটে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল, তেমনই শেয়ালগুলিও নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। গল্পের প্রায় শেষে আমরা দেখলাম, শেয়ালের দল সহদেবের আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাতে দূরে সরে যেতে যেতেও তাদের ফেলে আসা আস্তানার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রাণীদের মধ্যেও নিজেদের আশ্রয় থেকে উৎখাত হবার কষ্ট দেখা যায় গল্পে। এই গল্পে দেশভাগের ফলে উদ্বাস্ত মানুষের হতাশাগ্রস্ত অবস্থার

চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। যে বাস্তুজমি তেমন কার্যকরী নয় সেই জমিকে সহদেব আঁকড়ে রাখতে চেয়েছে। শেয়ালগুলি এবং সে উভয়ই জমির অধিকারকে কেন্দ্র করে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আবার শেয়ালগুলির নিজের আবাসস্থল ছেড়ে চলে যাওয়াও তাকে কষ্ট দিয়েছে কারণ সে নিজেও ভুক্তভোগী। আজ যেভাবে দুর্বল প্রাণিগুলি তাদের আবাসস্থল রক্ষা করতে অক্ষম হওয়ায় স্থানত্যাগ করে, কিছুদিন পূর্বে এই মনুষ্যেতর প্রাণিদের মতই দলে দলে মানুষ অসহায় ভাবে এই শেয়ালগুলির মতই ভিটের মায়া ত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছিল।

'শিকড়'[৫] গল্পে দেবব্রত দেশভাগের কারণে দশ-এগারো বছর বয়সে কলকাতায় চলে আসে। ওই সময়ের দুর্বিষহ পরিস্থিতির শিকার সে। পরিবার, পরিজন, নিজের জন্মভিটে - সবকিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল তাকে। এখন দেবব্রত ও তার স্ত্রী বিনতা কোচবিহারের স্কুলের শিক্ষক। তিন দশক কোচবিহারে কাটালেও তাদের এই স্থানটির প্রতি তাদের কোনো মোহ জন্মায়নি। এর কারণ অবশ্য দেবব্রত নিজেও খুঁজে পায়নি। দেবব্রতর জ্ঞাতি ভাই প্রদুম্ন তাকে তার জন্মভিটেয় যাওয়ার প্রস্তাব দেয় যা বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত। দেবব্রত প্রথমে আগ্রহ না দেখালেও, পরে স্বপ্নে নিজের ঠাকুরদাকে ভোরের কুয়াশায় কুল গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রদ্যুম্নর প্রস্তাবে রাজি হয়। আমরা দেখি যে দেবব্রত নিজের জন্মভিটে দশ-এগারো বছর বয়সে ছেড়ে চলে এলেও সেখানকার প্রতি টান, ভালোবাসা, রক্তের সম্পর্ক এখনও অনুভব করে। কিন্তু কোচবিহারে তিরিশ বছর থাকার পরও কোচবিহার ছেড়ে, সেখানে নিজের বাড়ি, সাজানো বাগান সব ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কোন কষ্ট বা দ্বিধার জন্ম হয়নি দেবব্রতর মনে। দেবব্রত স্ত্রীকে বলে -

> "... এর নামই বোধহয় শিকড়। উপড়ে তুলে আনতে গিয়ে অর্ধেকই মাটির ভিতরে থেকে গেছে। ছেঁড়া শিকড় কত জায়গাতেই তা ফের রোপণ করার চেষ্টা করলাম। হয়নি। নতুন করে আর মাটি আঁকড়ে ধরেনি সেই ছিন্নমূল।" (পৃ. ৪৪১)

দেবব্রত যথারীতি নিজের শিকড়ের টানে প্রদুম্নর সঙ্গে নিজের পূর্বপুরুষের ভিটের উদ্দেশে যাত্রা করে। পেট্রাপোল থেকে বাসে যশোর, সেখানে কোস্টার চেপে গ্রাম, নদী পেরিয়ে পিরোজপুর। সেখান থেকে ভুটভুটিতে ঝালকাঠি। দেবব্রত অদ্ভুত একটা শিহরণ অনুভব করে নিজের দেশের মাটিতে পা দিয়ে। বাড়ির পুরনো ঘাট, বৈঠকখানা, দুর্গা ও মনসার মণ্ডপ, সমাধি-এর মধ্যে তার শৈশব কেটেছিল। সেগুলো আজ অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। বসতবাড়ির অবস্থাও খারাপ। দেবব্রতর মা-বাবার ঘরে কিছু আসবাবপত্র এছাড়াও পিসিমার ঘর, যার ছত্রছায়ায় এক বছর বয়সের পর থেকেই সে আশ্রয় পেয়েছে। লেখক যেন নিজের কথাই বলে যাচ্ছেন দেবব্রতর কাহিনির মাধ্যমে। নিজের ঘরের স্মৃতিই আসলে ব্যক্ত করছেন লেখক। আমরা দেখি দেবব্রতর জ্ঞাতি দাদা প্রতুল মৃত্যুশয্যায় শায়িত, যার স্ত্রীর সাথে শৈশবে সে লুডো খেলেছে। সবকিছুই আজও মনে আছে তার। শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে এক সময় তার মনে হয় এই শিকড়ের, ফেলে আসা অতীতের শাখাপ্রশাখা তাকে ক্রমশ ঘিরে ফেলছে, তাই সে বেরিয়ে চলে আসে তার ঘর থেকে, শৈশবে কাটানো বাড়ির মায়ার ও স্মৃতির বেড়াজাল থেকে। তীব্র বেদনা ও গ্লানি সঙ্গে নিয়ে ফেরে সে কলকাতায়। সে অনুভব করে, যে শিকড়ের সাথে সে আজও আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে, সেখান থেকে চলে আসলেও শিকড়ের টান সারাজীবনই বহন করে চলতে হবে তাকে।

আমরা জানি বহু মানুষেরই ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল দেশভাগ। ওদেশের সম্পদশালী, সম্মাননীয় ব্যাক্তি রাতারাতি সব হারিয়ে এদেশে এসে বহুক্ষেত্রেই আর পুনরায় পূর্বের আর্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদা ফিরে পাননি। 'পদ্মার ইলিশ'[৬] গল্পে দেখা পাওয়া যায় তেমনই এক ভাগ্যবিড়ম্বিত উদ্বাস্তুর। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অনিমেষ বাবু যখন ইলিশ মাছ কিনে তার ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন ঠিক তখনই তার কোনো প্রতিবেশীর ঘর থেকে ইলিশের ঘ্রাণ পেয়ে অতীতের কর্মজীবনের দিনগুলির কথা তার স্মরণে আসে। অনিমেষ শুনতে পান কেউ যেন বলছে, -

> "মাস্টার মশয়, ইলশা মাছ আনছেন? পদ্মার ইলিশ?" (পৃ. ১৮৭)

এই প্রশ্নেই অনিবার্যভাবে অনিমেষের সুদাস রায়ের কথা মনে পড়ে। তখন তিনি উত্তরবঙ্গের রাজশাহির সীমানা সংলগ্ন একটি ছোটো শহরে চাকরীসূত্রে বসবাস করেন। সেখানেই সুদাস রায়ের সাথে তার আলাপ হয়। এক ছুটির দিনে অনিমেষ ইলিশ মাছ কিনে চায়ের দোকানে আড্ডা মারছিলেন। সেই দোকানের এক কোণে সুদাসবাবু বসতেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সুদাস রায় নিজের পরিবার সহ এদেশে এসেছিলেন। ওদেশে সচ্ছল অবস্থা থাকলেও এদেশে এসে তিনি দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলেন। জনৈক বামপন্থী নেতার সহায়তায় প্রাইমারি স্কুলে একটা চাকরি জোগাড় করলেও পেনশন ও

অন্যান্য প্রাপ্য টাকা তিনি পাননি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার কারণে সুতরাং পরিবার প্রতিপালন করতে করতে সঞ্চিত অর্থ ক্রমেই তার ফুরিয়ে আসে। যে লোক বাংলাদেশে থেকেছে তার কাছে পদ্মার ইলিশ খাওয়া এক উজ্জ্বল স্মৃতি। একটা সময় ছিল যখন সাধারণ মানুষ ইলিশ মাছ অনায়াসেই কিনে খেতে পারতো। কিন্তু দেশভাগের পর যখন এই দেশে ইলিশের দাম অনেক বেড়ে যায় তখন তা সাধারণ মানুষ অর্থাৎ সুদাসের মত লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অনিমেষ ইলিশ মাছ কিনেছে জেনে সুদাস রীতিমত উত্তেজিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন পদ্মার ইলিশ কিনা, ওজনে কেমন। এছাড়াও প্রায় অযাচিত ভাবেই সুদাস, অনিমেষকে প্রস্তাব দেন অনিমেষের স্ত্রী ইলিশ মাছ রান্না জানেন কিনা না হলে সে গিয়ে তাকে রান্না শিখিয়ে দেবে। অনিমেষ বুঝতে পারেন সুদাস তার সাধ্যের বাইরে থাকা ইলিশের প্রতি লোভ সংবরণ করতে অক্ষম। তাই অনিমেষ করুণাবশত তাকে রান্না শিখিয়ে দেওয়ার ছলে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। এতক্ষণে সুদাস বুঝতে পারেন তার মনের সংগোপনে থাকা লোভ প্রকাশ হয়ে গেছে তাই তিনি লজ্জিত হয়ে পড়েন। অনিমেষ ও তার স্ত্রী সুজাতা তাকে যত্ন করে খাওয়ান। খাওয়ার সময় কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে ও লজ্জায় প্রগলভ হয়ে নিজের দুঃখী জীবনের বৃত্তান্ত সুদাস না চাইতেও বলে ফেলছিলেন। তিনি জানান রান্না করা ইলিশ মাছের গন্ধেই ভাত খাওয়া হয়ে যায় তার। আমরা বুঝতে পারি এখনও সুদাসের যথেষ্ট আত্মসম্মানবোধ আছে তাই তিনি তার দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন। খাওয়ার পর সুদাসের বিষণ্ণতা প্রকাশ পায়। নিজের দেশ ছেড়ে এদেশে এসে সে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছে। সর্বোপরি দেশান্তরী হবার ডামাডোলে তার উপযুক্ত কাগজপত্র না থাকায় এই দেশে এসেও তার জীবনের কোনো উন্নতি বা সুরাহা হয় না। ভদ্র, শিক্ষিত হয়েও উঞ্ছবৃত্তির গ্লানি ক্রমশ তাকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। সুদাস অনিমেষের ঘর থেকে বেরোনোর সময় অনিমেষের স্ত্রী প্রণাম করে তাকে কুড়ি টাকা দেন এবং সুদাস যাতে অপমানিত বোধ না করেন সেজন্য জানান ব্রাহ্মণভোজন বিনা দক্ষিণাতে সম্ভব নয়। তাই আজ অনিমেষ ফ্ল্যাটের সিঁড়িতে ইলিশের প্রশ্নের সম্মুখীন হলে আপনা থেকেই সুদাসের কথা ভাবেন। কিন্তু আমরা গল্পের শেষে অনিমেষের স্মৃতির সূত্র ধরেই জানতে পারি এসবই অনিমেষের মনের ভুল কারণ তার কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীতে যখন তিনি গেয়েছিলেন সেই ছোট্ট শহরে, তখন দেখেছেন সুদাস উন্মাদ হয়ে গেছেন। পথে পথে ঘুরে চেঁচিয়ে দেশের নেতাদের গালিগালাজ করছেন। অসংখ্য মানুষের সাথে সাথে সুদাসও দেশত্যাগের ফলে বিপর্যস্ত। তার দারিদ্র্য, সম্মানহানি, ক্ষুধা সবকিছুর জন্যই দায়ী ছিল নিজের দেশ ছেড়ে চলে আসা। লক্ষ্যণীয় সুদাস পাগল হয়ে কিন্তু বর্তমান রাজনীতির কথা বলেন না, দেশভাগের সময়কালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই তার মাথায় ঘোরাফেরা করে। সুদাসের মনের অবচেতনে ছিল দেশভাগের জ্বালাময় স্মৃতি। 'পদ্মার ইলিশ' গল্পে নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে এসে সুদাসের কোনো রকমে বেঁচে থাকা, তার দুঃখ, গ্লানি, বিষণ্ণতা, অক্ষমতা তুলে ধরেছেন লেখক।

দুই ধর্মের মানুষের পারস্পরিক বিদ্বেষ নিয়ে লেখা আরেকটি গল্প 'কলাপাতা'[৭]। এই গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কীভাবে সযত্নে লালিত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। লেখক এখানে ব্যাঙ্ক কর্মী। রাঘবপুর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ছুটিতে যাওয়ায় লেখকের উপর দায়িত্ব বর্তায় ডেপুটেশানে সেই ব্রাঞ্চে গিয়ে আপাতত দায়িত্ব সামলানোর। কিন্তু বনধ-এর কারণে বাস বন্ধ থাকায় লেখক তাঁর নিজস্ব ব্যাংকের ব্রাঞ্চে এসে সেখানকার সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। তখনই কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে যে বর্তমানে ওই জেলার তিন বড়কর্তা পুলিশের এসপি, ডিস্ট্রিক্ট জজ, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তিনজনই মুসলিম। আগে দুজন মুসলিম অফিসার ছিলেন তাই বিষয়টা এতদিন সেভাবে কেউ খেয়াল করেনি কিন্তু নতুন ডিএমও মুসলিম হওয়াতে সবার টনক নড়েছে। হিন্দুদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে তিনজন মুসলিম আধিকারিক আসার ফলেই এবার মসজিদে নতুন চুনকাম হচ্ছে। লেখকের সহকর্মীরা আলোচনা করেন জেলাটা এবার বাংলাদেশকে দিয়ে দিলেই পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পরের দিন বনধ উঠে গেলে লেখক রাঘবপুর ব্রাঞ্চে জয়েন করেন। এদিকে রাঘবপুর ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার শিবু মনে মনে ভীষণভাবে হিন্দু। সে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য হাজার টাকা চাঁদাও দিয়েছে। ওই ব্রাঞ্চেরই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রাবণ মার্ডি ভারত সেবাশ্রম সংঘের অনাথালয়ে বড় হয়েছে ফলে সেও হিন্দুত্বের সমর্থক। তারা উভয়ই বিভিন্ন অজুহাতে মুসলিমদের ব্যাংকের বিভিন্ন লোন থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে - এই পর্যায়ে গেছে তাদের মুসলমান বিদ্বেষ। হানিফ মাস্টার ওই ব্যাংকেরই খাতক। সে আবার গর্বিত মুসলমান এবং নানা অছিলায় সে নিজের

ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে। লেখক তাকে নানা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেও হানিফ মাস্টার তার ধর্মের একেশ্বরবাদের কথা বলে হিন্দুত্বকে ব্যঙ্গ করলে শিবু পাল্টা মুসলমানের সংজ্ঞা দেয়- 'কলাপাতার উল্টোদিকে যারা ভাত খায়, তাদের মুসলমান বলে।' অর্থাৎ মুসলিমরা সব কাজ হিন্দুর উল্টোই করে। হানিফ মাস্টারের ব্যঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ হয়েও মনে মনে লেখক রেগে উঠেছিলেন। শিবুর এই উত্তরে হানিফ মাস্টার চুপ করে গেলে লেখক তৃপ্তি পান। মহরমের পরদিন বাসে একটি মুসলমান বালক শিবুর গায়ে বমি করে দিলে ওই বমির মধ্যে গোমাংসের টুকরো আছে এই আশঙ্কায় শিবু প্রায় উন্মাদ হয়ে যায়। আশঙ্কিত, প্রায় অপ্রকৃতিস্থ শিবু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এনে মাথা ন্যাড়া করে, গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনা। অবশেষে সে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করে। এরপরে এক বৃহস্পতিবার আবার হানিফ মাস্টার এসে আজগুবি গালগল্প উল্লেখ করে তার ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করলে লেখকের মনে হয় হানিফের মুখটা যেন শিবুর মতোই লাগছে। লেখক বলতে চেয়েছেন হিন্দু-মুসলিম সর্বত্র গোঁড়াদের চেহারাটা আসলে একই। কৃষক খুনকে কেন্দ্র করে বনধ, তিন মুসলিম বড়কর্তা, শিবুর পাগলামি, ঠিকাদারদের দাবি প্রত্যাখ্যান করায় ডিএম-এর বিরুদ্ধে তাদের ইসলাম ধর্মবিদ্বেষী স্লোগান ইত্যাদির মধ্যে কি কোনও যোগ থাকতে পারে - পরিশেষে এই প্রশ্ন জাগে লেখকের মনে।

'মানুষের পিছনদিক'[৮] গল্পটিতেও লেখক দেখিয়েছেন মুসলমানের প্রতি ভারতীয় তথা বাঙালি হিন্দুর মনে থাকা অন্ধ ঘৃণা। গল্পে দেখতে পাই আশ্রমের এক স্বামীজি আনন্দের চেহারা দেখে বলেছিলেন তার সঙ্গে রামচন্দ্রের চেহারার খুব সাদৃশ্য আছে। কাজেই তাকে যেতেই হবে অযোধ্যা মুক্ত করতে। ১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ভেঙে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ হয়েছিল, যদিও এই উল্লেখটি সরাসরি গল্পে নেই। আনন্দ যত বড় হয় তত সে নিজেকে সত্যিই রামচন্দ্র ভাবতে শুরু করে। সে হিন্দুত্বপন্থী রাজনীতির কট্টর সমর্থক হয়ে ওঠে এবং মনে করতে শুরু করে মুসলমানদের জন্যই হিন্দুদের যত দুর্দশা। তার এই অবস্থা দেখে তার মা-বাবা রাধিকা ও অবনী গিরিনকে ডেকে পাঠায়। গিরিন পার্টি সদস্য, আবার অবনীর ছোটবেলার বন্ধু ও ভগ্নিপতি। গিরিন আনন্দকে ছোটবেলায় ক্ষ্যাপাত সে মুসলমানের বাচ্চা বলে, তখন আনন্দ রেগে যেত, কিন্তু সেই একই রসিকতা আজ শুনে পরিণত বয়সের আনন্দের দুই চোখে রাগের সঙ্গে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ফুটে উঠে। সবাই বুঝতে পারলো আনন্দর এই ঘৃণা আসছে অন্তর থেকে। আজ যখন আনন্দ মালদা, মুর্শিদাবাদ, মথুরা কিংবা অযোধ্যায় মুসলমান আগ্রাসনের প্রসঙ্গ তুলে তাদের পাল্টা আক্রমণ করল তখন রাধিকা উন্মাদের মতন সব সংযম ভেঙে প্রকাশ করে দিলো আনন্দর জন্ম রহস্য। বিশ বছর আগে একাত্তরের যুদ্ধের সময় গিরিন ও অবনী উদ্ধার করেছিল রাধিকাকে জলা স্টেশনের ধারে, খান সেনাদের বাংকার থেকে, অপহৃত হবার ছয়-সাত মাস পরে, আরো একশো ছাব্বিশ জনের সঙ্গে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায়। সুমিতা চক্রবর্তীর কথায় -

> "প্রকৃতির নিয়মে নারীর শরীরে পুরুষের অত্যাচার সম্ভব। অনিচ্ছুক নারী দেহকে ভোগ ও উৎপীড়ন করতে পারে পুরুষ। তাই যে কোন সংঘর্ষে এক পক্ষ শত্রু-পক্ষের নারীদের অসম্মান, উৎপীড়ন এবং ধর্ষণ করে নিজেদের ক্রোধের, বিদ্বেষের এবং নিহিত স্কুল হিংস্র প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। যেকোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটে থাকে।"[৯]

দেশ ছাড়ার শূন্যতা অভিজিৎ সেন নিজের জীবনে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন, আমরা দেখলাম তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিও সেভাবে কাহিনিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এই সময় এক বিশাল জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তুরূপে পরিচিতি লাভ করেছিল। নিজের স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে অনিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধান করেছে তারা। তাই অভিজিৎ সেনের গল্পগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিরোধ, ছিন্নমূল মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, মানুষের নিজের বাড়ির স্মৃতি ইত্যাদি সংকটগুলি উঠে এসেছে।

Reference:

১. সেন, অভিজিৎ, 'কি লিখি - কেন লিখি', 'গদ্য সংগ্রহ', কলকাতা, চিন্তা, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ১৬২

২. সেন, অভিজিৎ, 'সীমান্ত', 'অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প', কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৯৯

৩. সেন, অভিজিৎ, 'হিমঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৪. সেন, অভিজিৎ, 'শেয়াল', 'দেবাংশী ও অন্যান্য গল্প', কলকাতা, প্রতিভাস, ১৫ এপ্রিল, ২০১১, পৃ. ১২৫

৫. সেন, অভিজিৎ, ‘শিকড়’, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ২০১৪, পৃ. ৪৩৮

৬. সেন, অভিজিৎ, ‘পদ্মার ইলিশ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

৭. সেন, অভিজিৎ, ‘কলাপাতা’, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, মে, ২০১৬, পৃ. ১৫১

৮. সেন, অভিজিৎ, ‘মানুষের পিছনদিক’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

৯. চক্রবর্তী, সুমিতা, ‘ছোটগল্পের বিষয়-আশয়’ চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, মার্চ, ২০১১, পৃ. ৯৯